বচন

★ বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের একত্ব ও বহুত্বের বোধই বচন। অর্থাৎ বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের এক বা একাধিক সংখ্যা নির্দেশ করার জন্য শব্দ শেষে ব্যবহৃত বর্ণ বা শব্দের প্রয়োগ দ্বারা বচন নির্দেশিত হয়। বচনের দ্বারা বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের সংখ্যার ধারণা জন্মে। বাংলায় বিভিন্ন পদের মধ্যে কেবল বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের বচনভেদ আছে, অন্যান্য পদের বচনভেদ নেই। যা কিছু গণনা করার যোগ্য তারই বচন থাকে। অর্থাৎ যার সংখ্যা হয়, যা গণনা করা চলে সেসব ক্ষেত্রে বচনের প্রয়োগ চলে।

বচনের প্রকারভেদঃ -

যেহেতু বচনে একত্ব ও বহুত্বের বোধ স্পষ্ট হয়, তাই বচন দুই প্রকার। যথাঃ ক. একচন ও খ. বহুবচন।

ক. একবচন : যে শব্দ দ্বারা কোন ব্যক্তি, প্রাণী বা বস্তুর (অর্থাৎ বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের) মাত্র একটি সংখ্যা বোঝায়, তাকে
একবচন বলে। অর্থাৎ যে শব্দ দ্বারা একত্বের বোধ হয় তা একবচন।

যেমন- আমি, সে, তুমি, বালক, আমটি, ছেলে ইত্যাদি।

খ. বহুবচন : যে শব্দ দ্বারা কোন ব্যক্তি, প্রাণী বা বস্তুর (তথা বিশেষ্য ও সর্বনামের) একের অধিক সংখ্যা বোঝায়, তাকে বহুবচন বলে। অর্থাৎ বহুবচন বলতে বহুত্বের বোধ বোঝায়।

যেমন- ফুলগুলো, লোকেরা, কলমগুলো ইত্যাদি।

যা সংখ্যা দ্বারা গণনার মাধ্যমে পরিমাপযোগ্য তারই কেবল বহুবচন হয়; যা সংখ্যা বা গণনায় পরিমাপ করা চলে না তার বহুবচন হয় না। ‘লোকেরা’-বহুবচন। কেননা তা সংখ্যায় পরিমাপযোগ্য, কিন্তু ‘দুধেরা’ বহুবচন নয়, কারণ তা সংখ্যায় পরিমাপযোগ্য নয়।

বহুবচনবোধক শব্দ গঠনের নিয়মাবলি:

বাংলায় একবচন হতে বহুবচন করার নিয়মাবলি নিম্নে আলোচিত হল-

১. বিভক্তি বা প্রত্যয়যোগে বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের শেষে রা, এরা, দিগকে, দের, দেরকে, এদের প্রভৃতি বিভক্তি বা প্রত্যয়যুক্ত হয়ে বহুবচন ঠিক হয়।

যেমন-জেলেরা, ছেলেদের, তাহারা, আমাদিগকে, তোমাদের, তোমাদেরকে, রহিমদের (এদের)।

২. অপ্রাণিবাচক ও প্রাণিবাচক বিশেষ্য ও সর্বনামের সাথে বহুবচনজ্ঞাপক প্রত্যয় গুলা, গুলো, গুলি, ইত্যাদি যুক্ত করে বহুবচন করা হয়।

যেমন- বইগুলো, টাকাগুলো, লোকগুলি ইত্যাদি।

৩. বিশেষ্যের পূর্বে সব, সকল, সমস্ত প্রভৃতি বহুত্বজ্ঞাপক পদ ব্যবহৃত হয়ে বহুবচন গঠিত হয়।

যেমন- সব নদী, সকল মানুষ, সমস্ত পথ ইত্যাদি।

৪. বিশেষ্য পদের পূর্বে একের অধিক সংখ্যাবাচক শব্দ ব্যবহৃত হয়ে বহুবচন গঠিত হয়।

যেমন-পাঁচজন মানুষ, দশজন ছাত্র, দুটো ভাত।

৫. বিশেষ্য পদের পূর্বে সর্বনামজাত বহুত্বজ্ঞাপক বিশেষণ ব্যবহৃত হয়ে বহুবচন গঠিত হয়।

যেমন- এত টাকা, কত লোক, কতক বই ইত্যাদি।

৬. সমষ্টিবাচক শব্দযোগে : বিশেষণ নয় এমন কতকগুলো সমষ্টিবাচক শব্দ বিশেষ্য পদের পরে বসে বহুবচন গঠিত হয়।

যেমন- কুল, গণ, দল, পাল, পুঞ্জ, মন্ডলী, মালা, রাজি, বৃন্দ, বর্গ, শ্রেণী, সমূহ, সব রাশি, সকল, মহল, আবলি ইত্যাদি। বিশেষণ নয় এমন সমষ্টিবাচক শব্দ বিশেষ্য পদের শেষে যুক্ত করে সৃষ্ট বহুবচনের উদাহরণ-পক্ষীকুল, জনগণ, দেবগণ, ছাত্রদল, যাত্রীদল, মেষপাল, পতঙ্গপাল, তারকাপুঞ্জ, সুধীমন্ডলী, শিক্ষকমন্ডলী, আলোকমালা, পংক্তিমালা, রত্নরাজি, বৃক্ষরাজি, পরিচালকবৃন্দ, খেলোয়াড়বৃন্দ, বন্ধুবর্গ, তরুশ্রেণী, পর্বতশ্রেণী, লোকসকল, কবিতাসমূহ, পুষ্পরাজি, জলরাশি, ভাইসকল, ভাইসব, নারীমহল, রচনাবলি, সংগীতাবলি ইত্যাদি।

৭. পদের দ্বিরুক্তির দ্বারা : বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয় ও ক্রিয়াপদ দুবার ব্যবহার করে বহুবচন গঠিত হয়।

যেমন- বিশেষ্যের দ্বিরুক্তি : জিজ্ঞাসিব জনে জনে। ফুলে ফুলে বাগান ভরেছে। লোকে লোকে লোকারণ্য। দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে।

বিশেষণের দ্বিরুক্তি : ছোট ছোট ফুল। বড় বড় কল। নতুন নতুন মেয়ে ইত্যাদি।

সর্বনামের দ্বিরুক্তি : যারা যারা এসেছে তারা তারা খেয়েছে। কে কে যাবে? যে যে যাবে সে সে টাকা পাবে।

ক্রিয়াপদের দ্বিরুক্তি : লোকটি খেটে খেটে মারা গেল। মেয়েটি নেচে নেচে উপার্জন করে।

অব্যয়ের দ্বিরুক্তি : যখন যখন আসবে তখন তখন মার খাবে।

৮. একবচনের রূপে বহুবচন : কখনও কখনও একবচন রূপে প্রকাশিত হয়েও বহুবচন বোঝায়। অর্থাৎ বহুবচনজ্ঞাপক চিহ্ন ব্যবহৃত না হয়ে একবচন রূপে লিখিত হলেও বহুবচন রূপে প্রকাশিত হয়।

যেমন-পাগলে কি না বলে, ছাগলে কি না খায়। এখানে কোন বহুবচন চিহ্ন জ্ঞাপিত হয়নি। কিন্তু 'পাগলে' এবং 'ছাগলে' বলতে 'সকল পাগল' ও 'সকল ছাগলকে' বুঝিয়েছে।

৯. ব্যক্তিবাচক বিশেষ্যের মাধ্যমে : সাধারণত ব্যক্তিবাচক বিশেষ্যের বহুবচন হয় না, কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যক্তিবাচক বিশেষ্যের বিশেষ ব্যবহারে বহুবচন জ্ঞাপিত হয়।

যেমন- কামালরা/ কামালেরা পাঁচ ভাই। এখানে 'কামালরা' বলতে কামাল ও অন্যান্য ভাইদের বোঝানো হয়, অর্থাৎ বহুবচন বোঝায়।

১০. সমার্থক পদে বহুবচন : সমার্থক পদ যোগে বহুবচন গঠিত হয়।
যেমন-বন্ধু-বান্ধব, চিঠিপত্র ইত্যাদি।

১১. একত্ববোধের মাধ্যমে বহুবচন : কখনও কখনও একবচন রূপে বললেও বহুবচন জ্ঞাপিত হয়।
যেমন- মেয়েটি ফুল কুড়াচ্ছে। এখানে 'ফুল' একবচন রূপে প্রকাশিত হলেও অনেকগুলো 'ফুল' বুঝায় অর্থাৎ বহুবচন বোঝায়।
তেমনি-সে টাকা গুণছে।

১২. বিদেশী শব্দের বহুবচন : বাংলা ভাষায় প্রচুর শব্দ আছে যা আরবি-ফারসিসহ বিভিন্ন ভাষা থেকে এসে বাংলা শব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এদের মধ্যে কিছু কিছু বিদেশী শব্দের বহুবচন সে ভাষার বহুবচন অনুসারে হয়।
যেমন-

একবচন	বহুবচন
মুরিদ	মুরিদান
আশেক	আশেকান
সাহেব	সাহেবান
কাগজ	কাগজাত
বুজুর্গ	বুজুর্গান

বহুবচনের প্রয়োগ বৈচিত্র্য

১. বিশেষ্য শব্দের একবচনের ব্যবহারেও অনেক সময় বহুবচন বোঝান হয়।

যেমন- সিংহ বনে থাকে। (এক ও বহুবচন উভয়) পোকার আক্রমণে ফসল নষ্ট হয়। বাজারে লোক জমেছে। বাগানে ফুল ফুটেছে।

২. বিশেষ্য ও বিশেষণ পদের দ্বিত্ব প্রয়োগেও বহুবচন সাধিত হয়।

যেমন- হাঁড়ি হাঁড়ি সন্দেশ। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা। বড় বড় মাঠ। লাল লাল ফুল।

৩. বিশেষ নিয়মে সাধিত বহুবচন।

যেমন- মেয়েরা কানাকানি করছে। এটাই করিমদের বাড়ি। সকলে সব জানে না।

পদাশ্রিত অব্যয় বা পদাশ্রিত নির্দেশক

পদাশ্রিত নির্দেশক :কয়েকটি অব্যয় বা প্রত্যয় কোন না কোন পদের আশ্রয়ে বা পরে সংযুক্ত হয়ে নির্দিষ্টতা ও অনির্দিষ্টতা জ্ঞাপন করে তাদের পদাশ্রিত নির্দেশক বা পদাশ্রিত অব্যয় বলে। বাংলায় নির্দিষ্টতা জ্ঞাপক প্রত্যয় ইংরেজি Definite Article The-এর স্থানীয়।

বচন ভেদে পদাশ্রিত নির্দেশকের বিভিনড়বতা পরিলক্ষিত হয়।

যেমন-

ক) এক বচনে-টি, টা, খানা, খানি, গাছা, গাছি যুক্ত হয়।

খ) বহুবচনে-গুলো, গুলি, গুলো, গুলিন যুক্ত হয়।

গ) কোন সংখ্যা বা পরিমাণের স্বল্পতা বোঝাতে-টে, টুক, টুকু, টুকুন, টো, গোটা যুক্ত হয়।

পদাশ্রিত নির্দেশকের ব্যবহার:

১. ক) ‘এক’ বা ‘এক যে’, ‘গোটা’ ইত্যাদি শব্দ আগে বসলে সংশিস্নষ্ট পদটি নির্দিষ্টতা না বুঝিয়ে অনির্দিষ্টতা বোঝায়।

যেমন: এক দেশে ছিল এক রাজা। এক যে ছিল সোনার কন্যা। গোটা দেশটাই ছারখার হয়ে গেছে।

খ) তবে ‘এক’ শব্দের সঙ্গে টা, টি যুক্ত হলে অনির্দিষ্টতা বোঝায়।

যেমন: একটি দেশ, সে যেমনই হোক দেখতে।

গ) সংখ্যাবাচক শব্দের সাথে টা, টি যুক্ত হলে নির্দিষ্টতা বোঝায়।

যেমন: তিনটি টাকা, দশটি বছর।

ঘ) নিরর্থকভাবেও নির্দেশক টা, টি-র ব্যবহার লক্ষণীয়।

যেমন: সারাটি সকাল তোমার আশায় বসে আছি। ন্যাকামিটা এখন রাখ।

ঙ) নির্দেশক সর্বনামের পরে টা, টি যুক্ত হলে তা সুনির্দিষ্ট হয়ে যায়।

যেমন: ওটি যেন কার তৈরি? এটা নয় ওটা আন। সেইটেই ছিল আমার প্রিয় কলম।

২. 'গোটা' বচনবাচক শব্দটির পূর্বে বসে নির্দিষ্টতা এবং অনির্দিষ্টতা উভয়ই বুঝায় এবং খানা, খানি পরে বসে। এগুলো নির্দেশক ও অনির্দেশক দুই অর্থেই প্রযোজ্য।

যেমন: গোটা দুই কমলা লেবু আছে।

দুখানা কম্বল চেয়েছিলাম (নির্দিষ্ট)।

গোটা সাতেক আম এনো।

একখানা বই কিনে নিও (অনির্দিষ্ট)।

কিন্তু, কবিতায় বিশেষ অর্থে 'খানি' নির্দিষ্টার্থে ব্যবহৃত হয়।

যথা- আমি অভাগা এনেছি বহিয়া নয়ন জলে ব্যর্থ সাধনখানি।

৩. টাক, টুক, টুকু, টো ইত্যাদি পদাশ্রিত নির্দেশক নির্দিষ্টতা ও অনির্দিষ্টতা উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়। যেমন: পোয়াটুকু দুধ দাও (অনির্দিষ্টতা)। সবটুকু ঔষধই খেয়ে ফেলো ।(নির্দিষ্টতা)

৪. বিশেষ অর্থে নির্দিষ্টতা জ্ঞাপনে কয়েকটি শব্দ। কেতা, তা, পাটি ইত্যাদি।

কেতা-এ তিন কেতা জমির দাম দশ হাজার টাকা মাত্র।

দশ টাকার পাঁচ কেতা নোট। তা-দশ তা কাগজ দাও।

পাটি-আমার এক পাটি জুতো ছিঁড়ে গেছে।

বর্ণের উচ্চারণ

স্বর বর্ণের উচ্চারণঃ

সূত্র--১: শব্দের অদিতে যদি ‘অ’ থাকে (শব্দের আদিতে কিংবা ব্যঞ্জনে যুক্ত) এবং পরে যদি ই (হ্রস্ব কিংবা দীর্ঘ), উ (হ্রস্ব কিংবা দীর্ঘ) থাকে তবে সে ’অ‘ এর উচ্চারণ ‘ও’ কারের মত হয়। যেমন: অভিধান (ওভিধান), গভীর (গোভির), মউ (মউ), বধু (বোধু) ইত্যাদি।

সূত্র--২: শব্দের আদ্য ‘অ’ এর পরে ‘্য’ (য) ফলা যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ থাকলে সে ক্ষেত্রে ‘অ’ এর উচ্চারণ প্রায়শ ‘ও’-কারের মত হয়, যেমন: অদ্য (ওদ্দো) বন্য (বোননো), শয্যা (শোজ্জা) ইত্যাদি।

সূত্র--৩: শব্দের আদ্য ‘অ’ এর পরে যদি ক্ষ, জ্ঞ (জ+ঞ) থাকলে সে ‘অ’ এর উচ্চারণ ‘ও’ কারের মত হবে। যেমন-দক্ষ (দোকখোঁ, লক্ষ্য (লোকখোঁ), যজ্ঞ (জোগ্গোঁ) ইত্যাদি।

ব্যতিক্রমঃ লক্ষমণ (লক্খোঁন), যক্ষমা (জক্খাঁ) ইত্যাদি। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে ‘ক্ষ’ এর সাথে অন্য বর্ণ যুক্ত হয়েছে বলে আদ্য ‘অ’ ‘ও’ কার রূপে উচ্চারিত হয় নি।

সূত্র--৪: আদ্য ‘অ’ এর পরে ‘ঋ’-কার যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ থাকলে ‘অ’ এর উচ্চারণ ‘ও’ কারের মত হবে। যেমন মসৃন(মোস্সৃন), যকৃত জোক্কৃত) ইত্যাদি।

সূত্র--৫: শব্দের প্রথমে অ যুক্ত র (্র) ফলা থাকলে সে আদ্য ‘অ’ এর উচ্চারণ ‘ও’ কারের মত হবে। যথা- ক্রম (ক্রোম্) শ্রম (স্রোম্), গ্রহ (গ্রোহো), শ্রবণ (স্রোবোন্) ইত্যাদি।

ব্যতিক্রম: অ-যুক্ত র (্র) ফলার পরে ‘য়’ থাকলে সে অ এর উচ্চারণ প্রায়শ অবিকৃত থাকে। যেমন-ক্রয় (ক্রয়্), ইত্যাদি।

সূত্র--৬: পূর্বে যে সব রেফ যুক্ত শব্দ্যে (য)-ফলা যুক্ত ছিল বর্তমানে নেই, সে সব শব্দের আদ্য ‘অ’ সাধারণত ‘ও’-কারের মত উচ্চারণ হয়। যথা-চর্যাপদ (চোর্জাপদ্), মর্যাদা (মোর্জাদা), পর্যায় (পোর্জায়) ইত্যাদি।

সূত্র--৭ : সাধু ভাষায় ব্যবহৃত যে সব শব্দে বা ক্রিয়া পদে ই ()) কার আছে কিন্তু চলিত ভাষায় সে ই-()) কার লোপ পেয়েছে সে সব শব্দের আদ্য ‘অ’ সাধারণত ‘ও’ কারের মত উচ্চারণ হবে। যেমন-করিল > করল (কোর্লো), ধরিয়া > ধরে (ধোরে), কলিকাতা > কলকাতা (কোল্কাতা) ইত্যাদি।

তবে কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে। যেমন-কহিব > কব (কবো), সহিবো > সইবো >সবো (শবো), হইব > হব (হবো), ইত্যাদি।

সূত্র--৮: একাক্ষর শব্দের প্রথমে 'অ' এবং পরে দন্ত্য-ন থাকলে সে 'অ' এর উচ্চারণ 'ও' কারের মত হয় যেমন-মন (মোন্), জন (জোন), বন (বোন্) ইত্যাদি।

ব্যতিক্রম: প্রাগুক্ত শব্দ সমাসবদ্ধ বা সন্ধি হলে 'অ' এর উচ্চারণ অবিকৃত থাকে। যেমন: বনবাসী, (বনোবাশি), বনস্পতি (বনোশ্পোতি), মনরম (মনোর্ম) ইত্যাদি।

বিঃ দ্রঃ ১, ২, ৩, ৪ নং সূত্রে যদি নেতিবাচক অর্থে 'অ' এবং সহার্থে বা সহিত অর্থে 'স' হয় তবে তার উচ্চারণ 'ও' কারের মতো হবে না। যেমন-অবিচার (অবিচার্), অনিয়ম (অনিয়ম্) অসীম (অশিম্), অন্যায় (অন্নায়্), সজীব (শজিব্), সমূল (শমুল্) ইত্যাদি। তবে নাম বোঝালে এ-না বোধক 'অ' 'ও' কারের মত উচ্চারিত হতে পারে। যেমন-অসীম (ওশিম্), অজিত (ওজিত্)।

মধ্য-অ

সূত্র--১: শব্দ মধ্যস্থিত (ব্যঞ্জনবর্ণে যুক্ত) আদ্য 'অ' এর মত ই ()), ঈ (ী), উ (ু), ঊ (ূ), ঋ (ৃ)-কার এবং ক্ষ, জ্ঞ,্য(য)-ফলার আগে থাকলে সে 'অ' এর উচ্চারণ সাধারণত 'ও' কারের মত হয়ে থাকে। যথা-কাকলি (কাকোলি), জননী (জনোনি), শতমূল (শতোমূল্) সুদক্ষ (শুদোক্খো), অদম্য (অদোম্মো) অসভ্য, (অশোবভো), অমসৃন (অমোস্সৃন্)

সূত্র--২: তিন বা তার অধিক বর্ণে গঠিত শব্দের মধ্য 'অ' এর আগে যদি অ, আ, এ এবং 'ও' কার থাকে তবে শব্দ মধ্যের 'অ' ও কারের মত উচ্চারিত হওয়ার প্রবণতা থাকে। যেমনঃ মতন (মতোন্), জলদ (জলোদ্), কানন (কানোন্), ওজন (ওজোন) ইত্যাদি।

ব্যতিক্রম: শব্দের আদ্য 'অ' যদি না বোধক এবং 'স' যদি সহিত অর্থে ব্যবহৃত হয় তবে মধ্য-অ অবিকৃত থাকাই বিধেয়। যেমন-অমল (অমল্), অমর (অমর্), অটল (অটল্), সবল (শবল্), সজল (শজল্) ইত্যাদি।

সূত্র--৩: বাংলা ভাষায় বেশকিছু সমাসবদ্ধ তৎসম শব্দ ব্যবহৃত হয়, যে গুলো পৃথক উচ্চারণে হসন্ত হলেও সমাস বদ্ধ অবস্থায় মধ্য 'অ' রক্ষিত হয়ে 'ও' কারের ন্যায় উচ্চারিত হয়। যেমন- পথচারী (পথোচারি), বনবাসী (বনোবাশি), রণতুর্য (রনোতুর্জো) ইত্যাদি।

অন্ত্য-অ

সূত্র--১: বাংলা ভাষায় বেশ কিছু বিশেষণে কিংবা বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত পদের অন্তিম 'অ' লুপ্ত না হয়ে 'ও' কারান্ত উচ্চারিত হয়। যেমন-ভাল (ভালো), খাট (খাটো), যত (যতো), এত (এ্যাতো), ইত্যাদি।

সূত্র--২: বাংলা ভাষায় বেশ কিছু দ্বিরুক্ত শব্দ বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হলে প্রায়ই অন্তিম 'অ' 'ও' কারান্ত উচ্চারিত হয়। যেমন-বড়-বড় (বড়ো-বড়ো), কাঁদ-কাঁদ (কাঁদো- কাঁদো), ছল-ছল (ছলো-ছলো) ইত্যাদি।

ব্যতিক্রম: করকর (করকর) তরতর (তরতর) ইত্যাদি।

সূত্র--৩: ১১ থেকে ১৮ পর্যন্ত সংখ্যাবাচক শব্দের শেষের 'অ' রক্ষিত এবং 'ও' কারান্ত উচ্চারিত হয়। যেমন-এগার (এ্যাগারো), তের (ত্যারো), ষোল (শোলো) ইত্যাদি।

সূত্র--৪: 'আন' প্রত্যয়ান্ত শব্দের অন্তিম 'অ' 'ও'-কারান্ত উচ্চারিত হয়। যেমন-তাড়ান (তাড়ানো), বলান (বলানো), চালান (চালানো), পাঠান (পাঠানো) ইত্যাদি।

সূত্র--৫: 'ত' (ক্ত) ও 'ইত' প্রত্যয়যোগে গঠিত বিশেষণ শব্দের অন্ত্য 'অ' 'ও' কারান্ত উচ্চারিত হয়। যেমন-নত (নতো), গত (গতো), পালিত (পালিতো), রক্ষিত (রোক্খিতো), ইত্যাদি।

সূত্র--৬: 'ই' কিংবা 'ও' কারের পর 'য়' (ইয়) থাকলে সেই 'য়' হসন্তরূপে উচ্চারিত না হয়ে প্রায়ই 'ও' কারের মতো উচ্চারিত হয়। যেমন-প্রিয় (প্রিয়ো), স্বীয় (শিয়ো), বিধেয় (বিধেয়ো), বরণীয় (বরোনিয়ো) ইত্যাদি।

ব্যতিক্রম: 'অ' কিংবা 'আ' এর পরে 'য়' থাকলে তার উচ্চারণ হসন্তরূপে উচ্চারিত হবে। যেমন- জয় (জয়্), খায় (খায়্), যায় (যায়্) ইত্যাদি।

সূত্র--৭: বিশেষ্য শব্দের শেষে 'ই' এবং বিশেষণ শব্দের শেষে 'ঢ়' থাকলে সাধারণত অন্ত 'অ' বিলুপ্ত না হয়ে 'ও' কারান্ত উচ্চারিত হবে। যেমন-কলহ (কলোহো), দেহ (দেহো), গাঢ় (গাঢ়ো) ইত্যাদি।

সূত্র--৮: 'তর' (তরো), 'তম' (তমো), প্রত্যয় যুক্ত বিশেষণ পদে অন্তিম 'অ' প্রায়ই 'ও' কারান্ত উচ্চারিত হয়। যেমন-ভিন্নতর (ভিন্নোতরো), বৃহত্তর (বৃহত্তরো), অধিকতম, (ওধিক্তমো), উচ্চতম (উচ্চোতমো) ইত্যাদি।

সূত্র--৯: 'ইব' 'ইল' 'ইতছে' 'ইয়াছ', 'ইতেছিল', 'ইয়াছিল' প্রভৃতি প্রত্যয় যোগে গঠিত ক্রিয়াপদের অন্তিম-'অ' সাধারণত 'ও'-কারান্ত উচ্চারিত হয়। যেমন-বলিব (বোলিবো), করিতেছ (কোরিতেছো), চলিতেছ (চোলিতেছো) ইত্যাদি।

সূত্র--১০: শব্দ শেষের 'অ' এর আগে ঐ, ঔ, ং,ঃ, ঋ কার থাকে তবে সে অন্তিম 'অ' এর উচ্চারণ 'ও' কারান্ত হবে। মেযন শৈল (শোইলো), বৈধ (বোইধো), মৌন (মোউনো) হংস (হংশো), দুঃখ (দুক্খো), মৃগ (মৃগো), তৃণ (তৃনো) ইত্যাদি।

সূত্র--১১: শব্দান্তে যুক্তব্যঞ্জন বর্ণ থাকলে সে ক্ষেত্রে অন্তিম 'অ' এর উচ্চারণ 'ও' কারের মত হয় যেমন-ভক্ত (ভক্তো), ধর্ম (ধর্মো), পদ্য (পদ্দো), দন্ত (দন্তো), দ্বন্ধ (দন্দো) ইত্যাদি।

আ

সূত্র--১: বাংলা উচ্চারণ সূত্র- অনুযায়ী একাক্ষর শব্দের 'আ' কিছুটা দীর্ঘ হয়। যথা-জাম (জা-ম্), বাঘ (বা-ঘ্), আম (আ-ম্) ইত্যাদি।

সূত্র--২: শব্দের আদিতে যদ্যি (য)-ফলাযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে 'আ'-কার থাকে তবে সেই 'আ'-কার 'এ্যা' কারের মত উচ্চারিত হয়। যেমন-খ্যাত (খ্যাতো), ব্যথা (ব্যাথা), ব্যাকরণ (ব্যাকরোন্) ইত্যাদি।

ই, ঈ, উ, ঊ

বাংলা ভাষার স্বরবর্ণের হ্রস্ব বা দীর্ঘ উচ্চারণের উপর শব্দের অর্থ নির্ধারিত হয় না। তবে একাক্ষর শব্দ বা পদের স্বরবর্ণকে কিছুটা দীর্ঘ উচ্চারণ করে থাকি। যেমন-দিন, তিন, চীন, চুপ, দূর এসব শব্দে ই, ঈ, উ, ঊ কিছুটা দীর্ঘ। কিন্তু দিনা, তিনি, চীনা, চুপি, দূরে এখানে অনেকটা হ্রস্ব।

এ

বাংলা ভাষার 'এ' ())-কার দুই ভাবে উচ্চারিত হয়। এ এবং 'এ্যা' । 'এ' স্বরবর্ণটির উচ্চারণ সূত্র- নিম্নে দেওয়া হলঃ

সূত্র--১: শব্দের প্রথমে যদি 'এ' (অথবা '‘’ ব্যঞ্জনযুক্তও হতে পারে) থাকে এবং তার পরে যদি ই ()), ঈ (ী), উ (ু) ঊ (ূ), এ ()), ও (vা), য়, র, ল, শ, হ থাকে তাহলে 'এ' অবিকৃতভাবে উচ্চারিত হবে। যেমন-একি (একি), দেখি (দেখি), বেশী (বেশি) ইত্যাদি।

ব্যতিক্রম:একের (এ্যাকের) নিক্ষেপ অর্থে ফেল (ফ্যালো), গেল (গ্যালো) ইত্যাদি।

সূত্র--২: মূল 'ই'-কার বা 'ঋ'-কার যুক্ত ধাতু কিংবা প্রাতিপদিকের সঙ্গে 'আ'-কার যুক্ত হলে সেই 'ই'-কার 'এ'-কারান্তের মত উচ্চারিত হবে। যেমন- মেলা (<মিল), কেতাব (<কিতাব) ইত্যাদি।

সূত্র--৩: একাক্ষর সর্বনাম পদের 'এ' সাধারণত অবিকৃত 'এ' কার রূপে উচ্চারিত হয়। যথা-কে, সে, যে, এ ইত্যাদি।

সূত্র--৪: 'তৎসম' বা 'সংস্কৃত' শব্দের আদ্য 'এ' প্রায়শ অবিকৃত 'এ' রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন-প্রেরক, বেদ, প্রেম, বেগবতী, পেচক, বেণী, মেদিনী, সেবক ইত্যাদি।

সূত্র--৫: সাধারণত শব্দের আদ্য 'এ'-কারের পর অ এবং 'আ' থাকলে 'এ'-কারের 'এ্যা'-কার রূপে উচ্চারিত হওয়ার প্রবণতা থাকে। কিন্তু 'অ' কিংবা 'আ'-এর পরিবর্তে 'ই'-কার, 'উ'-কার কিংবা 'এ'-কারের ন্যায় স্বরধ্বনি এলেই 'এ'-কার তার নিজস্ব উচ্চারণ ফিরে পায়। যেমন- এখন (এ্যাখোনো), তেমন (ত্যামোন্) চেলা (চ্যালা), কেন (ক্যানো), যেন (জ্যানো) ইত্যাদি।

সূত্র--৬: শব্দের আদ্য এ-কারের পর যদি ং , ঙ, ঙ্গ থাকে এবং তার পরে যদি 'ই' (হ্রস্ব বা দীর্ঘ) 'উ' (হ্রস্ব বা দীর্ঘ) অনুপস্থিত থাকে সে ক্ষেত্রে 'এ' 'এ্যা' -কারের ন্যায় হবে। যেমন-বেঙ [ব্যাঙ, কিন্তু ই ( ))-কার যুক্ত হলে বেঙি], ভেংচা উচ্চারিত [ভ্যাংচা কিন্তু ভেংচি] ইত্যাদি।

সূত্র--৭: 'এ'-কার যুক্ত একাক্ষর ধাতুর সঙ্গে 'আ' প্রত্যয় যুক্ত হলে সাধারণত সেই 'এ'-কারের উচ্চারণ 'অ্যা'-কার হয়ে থাকে। যেমন- বেচা (বেচ+আ=ব্যাচা), ঠেলা (ঠেল+আ=ঠ্যালা) গেলা (গেল+আ=গ্যালা) ইত্যাদি।

উচ্চারণ- কৌশল (ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ

ব্যঞ্জন বর্ণের উচ্চারণের সূত্র-সমূহ:

সূত্র--১: বাংলা শব্দে 'ক' থেকে সন্ধিসূত্রে আগত 'গ' এর সঙ্গে যুক্ত 'ব' ফলার উচ্চারণ অবিকৃত থাকে। যেমন-দিগ্বলয় (দিগ্বলয়), দিগ্বালিকা (দিগ্বালিকা) ইত্যাদি।

সূত্র--২: 'ব'-ফলা শব্দের আদ্যে যুক্ত হলে যুক্ত 'ব' এর উচ্চারণ উহ্য থাকে। যেমন-শ্বাস (শাশ্), ধ্বনি (ধোনি), জ্বালা (জালা) ইত্যাদি।

সূত্র--৩: শব্দের মাঝে কিংবা শেষে 'ব' ফলা থাকলে মূল বর্ণের উচ্চারণে দ্বিত্ব ঘটে। যেমন-পক্ব (পক্কো), বিদ্বান (বিদ্দান), অশ্ব (অশ্শো) ইত্যাদি।

সূত্র--৪: উৎ (উদ্) উৎসর্গের পরের 'ব' ফলার উচ্চারণ সাধারণত অবস্থিত থাকে। যেমন-উদ্বেগ (উদ্বেগ), উদ্বাহু (উদ্বাহু), উদ্বোধন (উদ্বোধন্) ইত্যাদি।

সূত্র--৫: 'ব' এবং 'ম' এর সঙ্গে 'ব'-ফলা যুক্ত হলে সেই 'ব' এর উচ্চারণ অবিকৃত থাকে। যমন-আববা, (আব্বা), লম্বা (লম্বা) ইত্যাদি।

'ম' -ফলা

সূত্র--১: পদের আদ্য ব্যঞ্জন বর্ণে 'ম' -ফলা সংযুক্ত হলে সাধারণত তার কোনো উচ্চারণ থাকে না। যেমন-শ্মাশান, (শঁশান), স্মৃতি (সৃঁতি), স্মরণ (শঁরোন্) ইত্যাদি।

সূত্র--২: পদের মধ্যে ও অন্ত্যে 'ম'-ফলা যুক্ত হলে মূলবর্ণটির উচ্চারণ দ্বিত্ব ঘটে। যেমন-ভস্ম (ভশ্শোঁ), রশ্মি (রোশ্শিঁ), কোষ্মিন (কোশ্শিঁন) ইত্যাদি।

সূত্র--৩: গ, ঙ, ট, ণ, ন, ম এবং ল-এর সঙ্গে সংযুক্ত 'ম'-এর উচ্চারণ অবিকৃত থাকে।

যেমন-

১. গ+ম-ফলা : বাগ্মী (বাগ্মি), যুগ্ম (যুগ্মো)।

২. ঙ+ম-ফলা : বাঙ্ময় (বাঙ্ময়), বাঙ্ময় (বাঙ্মুখ)।

৩. ট+ম-ফলা : কুট্মল (কুট্মল)।

৪. ণ+ম-ফলা : হিরণ্ময় (হিরন্ময়), মৃণ্ময় (মৃন্ময়)।

৫. ন+ম-ফলা : উন্মাদ (উন্মাদ), জন্ম (জন্মো)।

৬. ম+ম-ফলা : সম্মান (শম্মান্), সম্মতি (শম্মোতি)।

৭. ল+ম-ফলা : গুল্ম (গুল্মো), শাল্মলী (শাল্মোলি)।

সূত্র--৪: সংযুক্ত বর্ণের সঙ্গে 'ম' ফলা যুক্ত হলে সেই ম-এর উচ্চারণ উহ্য থাকে। যেমন-লক্ষ্মণ (লক্খোঁন্), সূক্ষ্ম (শুক্খোঁ), শুচিস্মিতা (শুচিশ্মিতা) সুস্মিতা (শুস্মিতা) কুষ্মান্ড (কুশ্মান্ডো) ইত্যাদি।

'য'-ফলা

পদের মধ্য কিংবা অন্ত্য বর্ণে 'য' ফলা যুক্ত হলে সেই 'য' এর উচ্চারণ হয় না। যেমনঃ সন্ধ্যা (শোন্ধা), সন্ন্যাসী (শোন্নাশি) ইত্যাদি। আবার কখনও কখনও বর্ণটি দ্বিত্ব হয়। যেমন-ধন্য (ধোন্নো), বন্যা (বোন্না), গদ্য (গোদ্দো), তথ্য (তোত্থো) ইত্যাদি।

'র'-ফলা

সূত্র--১: 'র' ফলা যদি শব্দের মধ্যে ও অন্ত্যে সংযুক্ত হয় তবে মূল বর্ণটির উচ্চারণ দ্বিত্ব হয় এবং 'র' উচ্চারিত হয়। যেমন-মা সূত্র- (মাৎত্রো), নম্র (নম্ম্রো), বজ্র (বজ্জ্রো), তীব্র (তীব্ব্রো) ইত্যাদি।

সূত্র--২: 'ঋ' যুক্ত বর্ণের মধ্য ও অন্ত্য 'ঋ' এর উচ্চারণ দ্বিত্ব হয় না। যেমন-বিকৃত (বিকৃতো), নেতৃ (নেতৃ), প্রকৃত (প্রোকৃতো) ইত্যাদি।

'ল-ফলা'

সূত্র--১: পদের মধ্য ও অন্ত্য 'ল'-ফলা যুক্ত বর্ণের উচ্চারণ দ্বিত্ব হয়। যেমন-অশ-xল (অস্পিল অশিশ-ল), শে-স্না (পেশশাঁ), আত্মশ-vঘা (আততোঁ¯-vঘা) ইত্যাদি।

হ-এর উচ্চারণ

'হ' এর সঙ্গে 'য'-ফলা যুক্ত হলে 'হ' এর নিজস্ব কোনো উচ্চারণ থাকে না প্রথমে জ ও পরে ঝ এর উচ্চারণ আসে। যেমন- বাহ্য (বাজ্ঝো), সহ্য (শোজ্ঝো), ঐতিহ্য (ঐতিজ্ঝো) ইত্যাদি।

দুই বা ততোধিক ব্যঞ্জন ধ্বনির মধ্যে স্বরধ্বনি না থাকলে সে ব্যঞ্জধ্বনি দুটো বা ধ্বনি কয়টি একত্রে উচ্চারিত হয়। এরূপ যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির দ্যোতনার জন্য দুটো বা অধিক ব্যঞ্জণবর্ণ একত্রিত হয়ে সংযুক্ত বর্ণ গঠিত হয়। সাধারণত এরূপে গঠিত সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণে মূল বা আকৃতি পরিবর্তিত হয়। যেমন - তক্তা (ত্+অ+ক্+ত্+আ=তক্তা)। এখানে, দ্বিতীয় বর্ণ ক ও ত - এর মূল রূপ পরিবর্তিত হয়ে 'ক্ত' হয়েছে।

যুক্ত ব্যঞ্জবর্ণ

ক্ত = ক্+ত ক্র = ক্+র

ক্ষ = ক্+ষ ঙ্ক = ঙ্+ ক

ঙ্ক = ঙ্+ক ঙ্গ = ঙ্+গ

জ্ঞ = জ্+ঞ ঞ্চ = ঞ+চ

ঞ্ছ = ঞ+ছ ঞ্জ = ঞ+জ

ট্ট = ট্+ট ণ্ড = ণ্+ড

ত্ত = ত্+ত

সূত্র- = ত্+র ত্রু = ত্+র+উ

ত্থ = ত্+থ দ্ধ = দ্+ধ

ন্ধ = ন্+ধ ভ্র = ভ্+র

ভ্রু = ভ্+র+উ ভ্রূ = ভ্+র+ঊ

রু = র্+উ রূ = র্+ঊ

শু = শ্+উ শ্রু = শ্+র+উ

শ্রূ = শ্+র+ঊ ষ্ম = ষ্+ম

ষ্ণ = ষ্+ণ স্ত = স্+ত

স্থ = স্+থ হু = হ্+উ

হৃ = হ্+ঋ হ্ন = হ্+ন

হ্ণ= হ্+ণ হ্ম = হ্+ম

ধ্বনিতত্ত্ব

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য :

- ✡ বাংলা বর্ণমালা উদ্ভূত হয়→ ভারতীয় আর্য ভাষার প্রাচীনতম লিপি ব্রাহ্মী লিপি হতে।
- ✡ ব্রাহ্মী লিপির সৃষ্টি হয়েছিল → সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার ধ্বনি গুলিকে প্রক জন্যে।
- ✡ ব্রাহ্মী লিপি পাওয়া যায় → খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে মহারাজ অশোকের শিলা থেকে।
- ✡ ব্রাহ্মী লিপির প্রাচীন রূপ পরিবর্তন হয়ে যে সব বর্ণমালার উদ্ভব হয়েছে → দেবনাগরী, বর্মি, শ্যামি, তিববতি প্রভৃতি।
- ✡ ধ্বনি : কোন ভাষার উচ্চারিত শব্দকে বিশে-ষণ করলে তার যে পরমা অবিভাজ্য ক্ষুদ্রতম অংশ পাওয়া যায় তাই ধ্বনি। যেমন - অ, আ, ক, খ
- ✡ বর্ণ : ধ্বনির চক্ষু গ্রাহ্য লিখিত রূপ বা ধ্বনি -নির্দেশক প্রতী চিহ্নকেই বর্ণ বলে। যেমন - অ, আ, ক, খ।
- ✡ অক্ষর : নি:শ্বাসের স্বল্পতম প্রয়াসে একই বক্ষ-স্পন্দনের ফলে যে বা ধ্বনিগুচ্ছ একবারে একত্রে উচ্চারিত হয় তাকে অক্ষর বলে। যে 'স্পন্দন' শব্দটিতে 'স্পন্দন', 'অন্' - এই দুইটি অক্ষর আছে।
- ✡ বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত বর্ণ গুলির সমষ্টিকে বর্ণমালা বলে।
- ✡ বর্ণ দু'প্রকার। যথা - স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ।
- ✡ স্বরবর্ণ : যে সকল বর্ণ অন্য ধ্বনির সাহায্য ছাড়া উচ্চারিত হয় তাকে স্বরবর্ণ বলে। স্বরবর্ণ - ১১ টি।
- ✡ ব্যঞ্জণবর্ণ : যে সকল বর্ণ স্বরের সাহায্যে ব্যক্ত বা উচ্চারিত হয় ত ব্যঞ্জণ বর্ণ বলে। ব্যঞ্জণ বর্ণ - ৩৯ টি।
- ✡ মাত্রা : বাংলা বর্ণ মালার কোন কোন বর্ণের উপরে 'রেখা' বা 'কষি' দেওয়া হয়। একে বলা হয় মাত্রা।

  1. (ক) পূর্ণ মাত্রাযুক্ত বর্ণ - অ আ ই ঈ উ ঊ ক ঘ চ ছ জ ঝ ট ঠ ড ন ফ ব ভ ম য র ল ষ স হ ড় ঢ় য়। মোট ৩২টি।
  2. (খ) অর্ধ মাত্রাযুক্ত বর্ণ - ঋ, খ, গ, ণ, থ, ধ, প, শ। মোট ৮টি
  3. (গ) মাত্রাহীন বর্ণ - এ ঐ ও ঔ ঙ ঞ ৎ ং ঃ ঁ । মোট ১০টি

- ✡ হসন্ত চিহ্ন : স্বরবর্ণ যুক্ত না হলে ব্যঞ্জন বর্ণের নিম্নে একটি বিশেষ দেওয়া হয়। ঐ চিহ্নের নাম হসন্ত চিহ্ন। যথা - ক্, দ্, বাক্।
- ✡ বর্ণ সংযোগ : বর্ণে বর্ণে যোগ করাকে বর্ণ সংযোগ বলে। বিভিন্ন বর্ণ সংযোগে শব্দ সৃষ্টি হয়।
- ✡ যেমন - ক + ব্ + ই = কবি।
- ✡ বর্ণ বিশে-ষণ: শব্দস্থিত বর্ণগুলি পৃথক করে দেখানোর নাম বর্ণ বিশে-ষণ।যথা - বিষ্ণু = ব্ + ই + ষ্ + ণ্+ উ।

★ উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী স্বরধ্বনির ৭টি অবস্থান:

উচ্চ	ই/ঈ		উ/ঊ
উচ্চ মধ্য	এ		ও
নিম্ন মধ্য	এ্যা		অ
নিম্ন		আ	

	অঘোষ		ঘোষ						
	অল্প প্রাণ	মহা প্রাণ	অল্প প্রাণ	মহা প্রাণ	নাসিক্য	তাড়ন জাত	পার্শ্বিক	উষ্ম/ শীষ	অন্তস্থ ধ্বনি
কণ্ঠ্য	ক	খ	গ	ঘ	ঙ			হ	য়
তালব্য	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ			শ	র
মূর্ধা	ট	ঠ	ড	ঢ	ণ	ড়/ঢ়		ষ	ল
দন্ড়	ত	থ	দ	ধ	ন	কম্পন জাত		স	ব
ওষ্ঠ্য	প	ফ	ব	ভ	ম	র	ল		

★ ক - ম পর্যন্ত ২৫টি ধ্বনিকে সঙর্শ ধ্বনি

★ য, র, ল, ব অন্ত:স্থ ধ্বনি।

★ হ - ঘোষ মহা প্রাণ ধ্বনি।

★ শ, ষ, স ঘর্ষণজাত ধ্বনি।

★ ং,ঃ,ঁ = পরাশ্রয়ী বর্ণ।

★বাংলা ভাষায় যৌগিক স্বরধ্বনির সংখ্যা পঁচিশ।বাংলা বর্ণমালায় যৌগিক স্বরজ্ঞাপক দুটো বর্ণ রয়েছে।ঐ এবংঔ।

উচ্চারণ (ব্যঞ্জণ ধ্বনি):

★ ব্যঞ্জন বর্ণ প্রধানত তিন ভাগে বিভক্ত, যথা -

1. (ক) স্পর্শ বর্ণ:- উচ্চারণ স্থানে অর্থাৎ কণ্ঠ, তালু প্রভৃতির সাথে জিহবা কোনো না কোনো অংশের সম্পূর্ণ স্পর্শ বা যোগ হয় ব এগুলো স্পর্শ বর্ণ। যথা - ক থেকে ম পর্যন্ত।
2. (খ) অন্ত:স্থ বর্ণ:- স্পর্শ বর্ণ ও উষ্ম বর্ণের মধ্যে অবস্থিত বলে এদের অন্ত:স্থ বর্ণ বলা হয়। যথা- য, র, ল, ব।
3. (গ) উষ্মবর্ণ:- উচ্চারণ উষ্মা অর্থাৎ বায়ু প্রধান ভাবে থাকে বলে এগুলোকে উষ্মবর্ণ বলে। যথা - শ, ষ, স, হ।

উচ্চারণ স্থান অনুসারে স্পর্শ পাঁচটি বর্ণের বিভাগ আছে। সে গুলোকে বর্গ বলে।

যেমন - ক-বর্গ, চ-বর্গ, ট-বর্গ, ত-বর্গ ও প-বর্গ।

- স্পষ্ট বর্ণ:- ক-বর্গ, ট-বর্গ এবং প-বর্গের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতু বর্ণগুলোর উচ্চারণকালে, মুখ-বিবরের বিশেষ স্থান স্পষ্ট হয় বলে এগু স্পেষ্ট বর্ণ।
- ঘৃষ্ট বর্ণ:- চ, ছ, জ, ঝ এদের উচ্চারণকালে জিহবা ও তালুর স্পর্শের পরে উভয়ের মধ্যে বায়ুর ঘর্ষণজাত ধ্বনি বের হয় বলে এগুলোকে ঘৃষ্ট বর্ণ বলে।
- অঘোষ বর্ণ:- যে সব বর্ণের উচ্চারণ কালে স্থান ও করণের আঘাতজনিত ঘোষ বা শব্দ শ্রুত হয় না, সে গুলোকে অঘোষ বর্ণ বা শ্বাস বর্ণ বলা হয় যথা- ক খ চ ছ ট ঠ ত থ প ফ শ ষ স।
- ঘোষ বর্ণ:- যে সব বর্ণের উচ্চারণকালে স্থান ও করণের আঘাতজনিত ঘোষ বা শব্দ শুনতে পাওয়া যায় বলে এগুলোকে ঘোষ বর্ণ বলা হয়। যথ প্রতি বর্গের শেষ তিনটি বর্ণ এবং হ।
- প্রতি বর্গের প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম বর্গের উচ্চারণকালে এদের সাথে প বা শ্বাস বায়ু অল্প নির্গত হয় বলে এগুলোকে অল্পপ্রাণ বর্ণ বলে।
- বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ এবং উষ্ম বর্ণের উচ্চারণকালে এদের সাথে প বা শ্বাস বায়ু অধিক নির্গত হয় বলে এগুলোকে মহাপ্রাণ বর্ণ বলে।
- ‘য’, ‘র’, ‘ল’, ‘ব’ - এদের বিশুদ্ধ উচ্চারণ স্বর ও ব্যঞ্জন ধ্বনির মধ্যবত এরা খাঁটি ব্যঞ্জনবর্ণ নয় এবং খাঁটি স্বরবর্ণও নয়। এজন্য য ও ব - অের্ধস্বর এবং র ও ল-কে তরলস্বর বা অর্ধব্যঞ্জন বলে।
- ‘র’- জিহবার অগ্রভাগ কম্পিত করে এ বর্ণ উচ্চারণ হয় বলে একে কমঙনজাত বর্ণ বলে।
- ‘ল’-এর উচ্চারণকালে জিহবার দু’ পাশ দিয়ে বায়ু বের হয় বলে একে পার্শ্বিক বর্ণ বলে
- শ, ষ, স- তিনটি শুদ্ধ উষ্ম বর্ণ উচ্চারণকালে শিশ দেওয়ার মত শব্দ হয় বলে এগুলোকে শিশবর্ণ বলা হয়।
- ‘ড়’, ‘ঢ়’ - জিহবার নিম্নভাগ দিয়ে দন্তমূলে তাড়না করে এদের উচ্চারণ করতে হয় বলে এদেরকে তাড়নজাত বর্ণ বা তড়িত ব্যঞ্জনবর্ণ বলে।
- অনুস্বার ও বিসর্গকে অযোগবাহ বর্ণ বলে।
- চন্দ্রবিন্দু (ঁ) চিহ্ন বা প্রতীকটি পরবর্তী স্বরবর্ণের অনুনাসিকতার দ্যোতনা করে। এজন্য এটিকে অনুনাসিক বর্ণ বলে।

সব ধরনের ই-বুক ডাউনলোডের জন্য
MyMahbub.Com